অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বাস্থ্যসেবায় কমিউনিটি ক্লিনিক

মুহাম্মদ ফয়সুল আলম

তৃণমূল মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রকল্প এখন স্বাস্থ্যসেবায় মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। মা ও শিশুর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় এক নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছে এ প্রকল্প। এসব ক্লিনিকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে। কমিউনিটি ক্লিনিক এখন সাধারণ মানুষের ভরসাস্থলে পরিণত হয়েছে। এক কথায় বলা যায় কমিউনিটি ক্লিনিক হচ্ছে সরকারের সর্বনিম্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কাঠামো।

সিরাজগঞ্জের তাড়াশ থানায় কুসম্বি কমিউনিটি ক্লিনিকে চিকিৎসা সেবা নিতে আসা লিপন কুমার সরকার বলেন, গত কয়েকদিন যাবত জ্বর, সর্দি ও কাশিতে ভুগছি। আমার পক্ষে ১৪ কিলোমিটারেরও বেশি দূরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যাওয়া সম্ভব নয়। আবার করোনার এই সময়ে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলতে বলা হয়েছে। সরকারি হাসপাতালে অনেক জায়গা থেকে রোগী আসবে কে কোথায় থেকে আসবে তার শরীরে করোনা ভাইরাস আছে কি-না এসব ভেবেই বাড়ির কাছে কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবা নিতে এসেছি। এখানে স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি বিনামূল্যে ঔষধপত্র পাই আমরা।

কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবা গ্রহণকারী কেয়া সরকার বলেন, এই ক্লিনিকে অনেক ধরনের চিকিৎসা হয়। ঔষধ কিনতে হয় না। বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়। আগে শহরে গিয়ে চিকিৎসা নিতে হতো। সময় লাগতো বেশি, টাকাও খরচ হতো। কিন্তু করোনার এই পরিস্থিতিতে এখন শহরে যেতে নিরাপত্তা বোধ করি না। উপরের দুটি ঘটনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এখন সাধারণ রোগের পাশাপাশি করোনার চিকিৎসা তারা কমিউনিটি ক্লিনিক থেকেই পাচ্ছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চিকিৎসা সেবাকে মানুষের দৌড়গোঁড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য ১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত মেয়াদে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কাজ শুরু করেন এবং সে সময় ১০ হাজার ৭২৩টি ক্লিনিক চালু করা হয়। এর ফলে ঐ সময়কালে চিকিৎসা সেবা দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছাতে শুরু করে। কিন্তু ২০০১ সালে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে দেশের দরিদ্র মানুষ আবারো চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হতে শুরু করে।

২০০৯ সালে পুনরায় কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। বর্তমানে দেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে ১৩ হাজার ৮৬১টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু রয়েছে। আরো এক হাজার ২৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক কর্মসূচির আওতায় আসছে। ২০০৯ সাল থেকে ২০২০ সালের মধ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকে ভিজিটের সংখ্যা ১০০ কোটির অধিক। এর মধ্যে ২ কোটি ৩২ লাখের অধিক সংখ্যক জটিল রোগীকে উচ্চতর পর্যায়ে রেফার করা হয়। সরকারের এই মহতী উদ্যোগে দেশের অসহায় দুস্থ মানুষ সহজে ও বিনাপয়সায় হাতের নাগালে চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে।

সার্বিক প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যার আওতায় অন্তঃসত্ত্বা নারী প্রসবপূর্ব (প্রতিষেধক টিকাদানসহ) এবং প্রসবপরবর্তী (নবজাতকের সেবাসহ) সেবা প্রদানকারী কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো সময়মতো যক্ষ্মা রোগের প্রতিষেধক টিকাদান, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, পোলিও, ধনুষ্টংকার, হাম, হেপাটাইটিস-বি, নিউমোনিয়া, ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ, কালা-জ্বর, ডায়রিয়াসহ, অন্যান্য অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং সেগুলোর সীমিত চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করছে। এছাড়া জ্বর, ব্যথা, কাটা/পোড়া, হাঁপানি, চর্মরোগ, ক্রিমি এবং চোখ, দাঁত ও কানের সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে লক্ষণভিত্তিক প্রাথমিক চিকিৎসাও প্রদান করা হচ্ছে। ক্লিনিকগুলোতে অস্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সংক্রান্ত বিভিন্ন উপকরণসহ বিনামূল্যে ৩০ ধরনের ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে। বছরে প্রায় ২০০ কোটির অধিক ঔষধ এই ক্লিনিকের মাধ্যমে সরবরাহ করা হচ্ছে।

ক্লিনিকগুলো বাড়ির কাছাকাছি হওয়ায় এবং সেখানে বিনামূল্যে সাধারণ রোগের ওষুধ পাওয়া যায় বলে দিন দিন এর সেবাগ্রহীতার সংখ্যাও বাড়ছে। সরকারের পৃথক দুটি জরিপেও এসব ক্লিনিক নিয়ে ৮০ থেকে ৯৮ শতাংশ মানুষের সন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করা হয়। জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের (নিপোর্ট) জরিপে দেখা গেছে, বাড়ির পাশের ক্লিনিক থেকে ওষুধ আর পরামর্শ পেয়ে ৮০ শতাংশ মানুষই সন্তুষ্ট।

গ্রামীণ জনগণের অত্যাবশ্যকীয় চিকিৎসা সেবা বিতরণের প্রথম স্তর হলো কমিউনিটি ক্লিনিক। তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ মানুষের চাহিদা অনুসারে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার হিসেবে শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়। এখানে কর্মরত কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার, স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকেন, যেমন- স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সেবা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ; প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা প্রদান; মা ও শিশুর খাদ্য ও পুষ্টির বিষয়ে সহায়তা প্রদান; ছোঁয়াচে রোগবালাই থেকে দূরে থাকার বিষয়ে পরামর্শ দান এবং জটিলতর রোগের চিকিৎসার জন্য উপজেলা ও জেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রেরণ। তাছাড়া করোনা সংক্রমণের যুদ্ধের ময়দানে বীরের মতোই লড়ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। মহামরি মুখে প্রান্তিক মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারা।

কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত শীর্ষস্থানীয় এক কর্মকর্তা বলেন, শুধু স্বাস্থ্যসেবাই নয় কর্মক্ষেত্র তৈরিতে এই কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি)-দের সঙ্গে সপ্তাহে ৩ দিন সেবা দিয়ে থাকেন একজন পরিবার কল্যাণ সহকারী ও একজন স্বাস্থ্য সহকারী। এ পর্যন্ত ১৪ হাজার ৮৭৮ জন সিএইচসিপি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে ৫৪ শতাংশ নারী অর্থাৎ নারীর ক্ষমতায়ন দেশব্যাপী স্বীকৃত। বর্তমানে সিইচসিপিদের বেতন ভাতা বহন করছে কমিউনিটি বেসড হেলথ কেয়ার (সিবিএইচসি)।

১৫-৪৯ বছর বয়সের সন্তানধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মায়েদের সঠিক তালিকা প্রণয়ন, জন্মের ২৮ দিনের মধ্যে শিশুর জন্মনিবন্ধন, এক থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের ৬ মাস পর পর প্রয়োজনীয় ভিটামিন-এ খাওয়ানো এবং রাতকানা রোগে আক্রান্ত শিশুদের খুঁজে বের করা ও তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকে। কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারগণ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণকারীদের জটিল কেইসগুলোকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানপূর্বক দ্রুত উচ্চতর পর্যায়ে রেফার করেন।

শুক্রবার ব্যতীত সপ্তাহে ৬ দিন কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার কমিউনিটি ক্লিনিকে উপস্থিত থেকে সেবা প্রদান করেন। স্বাস্থ্যকর্মী এবং পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ সপ্তাহে ৩ দিন করে কমিউনিটি ক্লিনিকে বসেন। কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারগণ স্বাস্থ্য সহকারীদের তদারকি করবেন। প্রশাসনিক কর্ম এলাকায় (প্রতি ইউনিয়নে ৯টি) ওয়ার্ডভিত্তিক মাঠকর্মীদের পদায়ন করা হয়। যদি কর্মীর সংখ্যা বেশি হয় তবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে তা সমন্বয় করে পদায়ন করা হয়।

স্বাস্থ্য সহকারী অথবা পরিবার কল্যাণ সহকারী একে অপরের অনুপস্থিতিতে কমিউনিটি ক্লিনিকে সকল সেবা নিশ্চিত করেন। কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবাগ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য স্বাস্থ্য সহকারী এবং পরিবারকল্যাণ সহকারী বাড়ি পরিদর্শনকালীন সময় আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা সম্পর্কিত তথ্য প্রদানে সক্রিয়ভাবে কাজ করে থাকেন। করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি কমিউনিটি ক্লিনিকের কর্মীদের তথ্য সংগ্রহের কাজে লাগানোর পরামর্শ চিকিৎসকদের। ইতিমধ্যেই ডিজিটাল সার্ভিলেন্স চালুর উদ্যোগ নিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

যে সকল গর্ভবতী মহিলা কমিউনিটি ক্লিনিক হতে প্রসবপূর্বক ও প্রসবোত্তর সেবা গ্রহণ করেননি, স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবারকল্যাণ সহকারীগণ তাদের খুঁজে বের করে কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা ব্যবস্থায় নিয়ে আসেন। যে সব নারী-পুরুষ ইপিআই, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ ইত্যাদি বিষয়ে কমিউনিটি ক্লিনিক হতে সেবা গ্রহণ করেননি তাদেরও এ সেবার আওতায় নিয়ে আসা হয়। কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম সফল, শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবর কল্যাণ কেন্দ্র রেফারেল সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ক্লিনিক স্বাভাবিক প্রসবের সংখ্যা ৮৫ হাজারের বেশি।

কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্যসেবার সুফল ভোগ করছেন গ্রামীণ জনপদের মানুষ। দিনে দিনে সম্প্রসারিত হচ্ছে কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্যসেবার কার্যক্রম। ভবিষ্যতে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোই হবে গ্রামীণ জনপদের স্বাস্থ্যসেবার তথ্য ভান্ডার। সরকার গ্রামীণ জনপদের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে তহবিল গঠন করা হবে। স্বেচ্ছায় যারা দেবেন, তাদের কাছ থেকেই তহবিলের টাকা গ্রহণ করা হবে। রোগীদের টাকা দিতে বাধ্য করা হবে না। রোগীদের কেউ দিতে চাইলে তাও গ্রহণ করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। জনগণকে সম্পৃক্ত করে যে-কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করলে তা সফল হবেই, এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ এ কমিউনিটি ক্লিনিক। কমিউনিটি ক্লিনিক এমন একটা উদ্ভাবনী শক্তি, যার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এটা বাংলাদেশের জন্য এক বিরাট অর্জন। এ অর্জনে দেশবাসী গর্বিত।

#

৩১.০৮.২০২০ পিআইডি ফিচার